গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৭ - ১৩ অক্টোবর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বর্ধিত বাসভাড়া প্রতিরোধে এবং চাষীদের আত্মরক্ষার লড়াইতে সামিল হোন

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ সেপ্টেম্বর দলের রাজ্য দপ্তরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

সম্প্রতি রাজ্য সরকার যেভাবে বাসভাড়া বাড়িয়েছে তা নজিরবিহীন। যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি জনদরদী বলে দাবি করে, সেই সিপিএম সরকারই জনগণের উপর পুজোর মুখে এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ করল। গত কয়েক বছরের মতো এবারেও তারা বাস মালিকদের দিয়ে দু'দিনের ধর্মঘট করিয়ে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়িয়ে তারপর এই ভাড়াবৃদ্ধি চাপিয়ে দিল তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে। তেলের দাম সব রাজ্যেই বেড়েছে; তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি — প্রথম স্টেজের বাসভাড়া দিল্লি-চেন্নাই-কর্নাটকে যখন ২ টাকা, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবান্দ্রমে ২ টাকা ৫০ পয়সা, গৌহাটি ও পাটনায় ৩ টাকা, তখন পশ্চিমবাংলায় বাসে উঠলেই ৪ টাকা। এর আগেও তারা এইভাবে ভাড়া বাড়িয়েছে। আমরা তখনই বলেছি — নিরপেক্ষ কমিটির কাছে হিসেব দেখানো হোক যে, চলতি ভাড়ায় মালিকদের লোকসান হচ্ছে নাকি তাদের লাভ খানিকটা কমছে। সরকার আজ পর্যন্ত তা করেনি। এর আগে ২০০২ সালে ভাড়াবৃদ্ধির সময় পরিবহন মন্ত্রী বলেছিলেন, ভাড়া আমরা একটু বেশি বাড়িয়েছি যাতে তেলের দাম বাড়লেও ভাড়াবৃদ্ধি করতে না হয়; তা সত্ত্বেও তারা বারবার ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। ২০০২ সালে তাঁরা ১৫ শতাংশ ভাড়াবৃদ্ধি করে বলেছিলেন — এর মধ্যে ৯ শতাংশ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। অথচ যাত্রীরা জানে না — কোথায় কী স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু এই বাবদ বাড়ানো বিপুল ভাড়া বাস মালিকদের পকেটে বছর বছর ঢুকছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে আমরা দেখছি প্রতিদিনই জীবন হাতে নিয়ে যাত্রীদের বাসে উঠতে হচ্ছে; প্রায় প্রতিদিনই বাস-অ্যাকসিডেন্টে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, গুরুতর আহত হচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে। এবং এটা ঘটছে এইজন্যই যে, বাস-কর্মচারীদের স্থায়ী কাজ নেই, বেতন নেই, বোনাস নেই; তারা কমিশন নির্ভর। সেজন্য বেশি টিকিট সেল দেখিয়ে বেশি কমিশন পেতে তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে তার ফলেই এ্যাক্সিডেন্ট ও যাত্রীদের মৃত্যু বাড়ছে। আবার দেখুন, ট্রাম তো

সাতের পাতায় দেখুন

বিভিন্ন রাজ্যে বাসভাড়া

দিল্লি	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
চেন্নাই	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
কর্ণাটক	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
গৌহাটি	—	৩.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ
পাটনা	—	৩.০০ টাকা ৬ কিমি পর্যন্ত
ত্রিবান্দ্রম	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ

আর পশ্চিমবঙ্গে ?

বাসে উঠলেই — ৪.০০ টাকা।

ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ

৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পথ অবরোধ। (উপর থেকে) হাজরা, কলেজ স্ট্রীট, এসপ্ল্যানেড

(সংবাদ দুই পাতায়)

বানের গ্রাসে চাষী, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল এস ইউ সি আই

শুধু সালিম গোষ্ঠীর গ্রাসে চাষী সর্বস্বান্ত হচ্ছে তাই নয়, চাষীর চোখের সামনেই ভেসে যাচ্ছে তার সর্বস্ব। তার জমি থেকেও নেই। ১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর — দু'দিনের ঘূর্ণিঝড়ে ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে তাদের হাজার হাজার বিঘা ধান জমি ও মেছোঘেরি চলে গেছে লোনাজলের তলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, কুলতলি, জয়নগর-২, গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি ব্লকের কয়েক হাজার চাষীর মাথায় হাত। লোনাজলে সম্বৎসরের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, মৎস্যজীবীদের সারা বছরের জীবিকা ভেসে গেছে; সারা বছর চলবে কী করে? খাবে কী? মিষ্টি জলের খাল ও পুকুর ভরে গেছে লোনা জলে, ধানগাছ, শাকসব্জি, মৃত জীবজন্তুর পচনে জল বিষাক্ত। টিউবওয়েলগুলো অকেজো। পানীয় জলের অভাবে মানুষ সেই বিষাক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে জলোচ্ছ্বাসের পূর্বেই প্রশাসনের সর্বস্তরে জানানো হয়েছিল। জলোচ্ছ্বাসের সময় ও তার অব্যবহিত পরে সব বিডিও অফিসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান জয়নগরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিপন্ন সুন্দরবনবাসীর দুর্দশা তুলে ধরেন। ঐদিনই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি মোকাবিলার দাবি জানান। পরদিন ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ কলকাতায় রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভয়াবহ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেডস্ দেবপ্রসাদ সরকার, বিধান চ্যাটার্জী, প্রশান্ত ঘটক ও তপন রায়চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে নদীবাঁধ মেরামত, এলাকা থেকে লোনাজল নিষ্কাশন, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাশ্রয় মানুষের জন্য আশ্রয় ও আর্থিক অনুদান, দুর্গত এলাকায় শিশুখাদ্য ও ওষুধ সহ মেডিকেল টিম পাঠানো এবং ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

অথচ এই সর্বনাশ অনিবার্য ছিল না। সুন্দরবনের এই দ্বীপাঞ্চলগুলির হাজার হাজার মাইল নদীবাঁধ মেরামতির অভাবে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল অবস্থায় ছিল। বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সেচবিভাগ বা স্থানীয় প্রশাসন — কেউই এগুলি মেরামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য সরকারের একটি পৃথক দপ্তর থাকলেও এবং উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তা যে সুন্দরবনের নদীবাঁধ মেরামতির কাজে ব্যয় হয়নি — একটি জলোচ্ছ্বাসই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'সুন্দরবন বাঁচাও' স্লোগান তুলে আজ থেকে ৬ মাস আগে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকখালিতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার আয়োজন করেছিল। গত ২৬ মার্চের সেই জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবনবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ''সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে সেচ, বিদ্যুৎ, ব্রিজ এবং নদীবাঁধের কাজ হবে'' (গণশক্তি ২৭-৩-০৫)। কিন্তু ৫/৬ মাসে নদীবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার ১ লক্ষ টাকাও খরচ করেনি। আমরা সে সময় গণদাবীর পাতায় (২০-২৬ মে, ২০০৫) সাধারণ মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

খুনি স্বামীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

৭ মাস আগে বিয়ে হওয়া এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে ৩১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার মহেন্দ্রনগর গ্রামে। জানা গেছে, বধূটি ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মৃতদেহ পুলিশ থানায় নিয়ে গেলেও ডায়েরি নথিভুক্ত করেনি। এই নৃশংস ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে মেয়ের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে থানায় ডায়েরি করা হয়। এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করে ঘাতক স্বামী সহ অন্যান্য দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চাপে পড়ে পুলিশ স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১২ সেপ্টেম্বর থানা ডেপুটেশনে শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। পরিবারে এবং বাইরে যেভাবে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে তা থেকে বাঁচতে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিবাদী ভূমিকায় উৎসাহিত হয়ে এলাকার মহিলারা 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করেন। এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন কমরেডস্ কবিতা পন্ডা, সুনন্দা পণ্ডা, হেমা মাইতি, মাধুরী সাহু, শেফালি জানা, খুকুমণি মাইতি, আসমা বিবি, নমিতা পণ্ডা প্রমুখ।

কুলতলিতে মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে সভা

কুলতলি থানার অন্তর্গত কাঁটামারি গ্রামে সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে কাঁটামারি হাটে তিন শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলার উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের ঢালাও মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এসের জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড সফি পৈলান, এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গোষ্ঠ ভুঞ্যা, কমরেড বিশ্বনাথ নস্কর, কমরেড সমতুল নস্কর। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল। প্রতিবাদ সভা থেকে ১৪ জনের মদ বিরোধী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

মুর্শিদাবাদের রানিনগরে মাদক বিরোধী কমিটির আন্দোলন

রানিনগর বাজার সংলগ্ন পঞ্চায়েত ভবনের পাশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান খোলার আয়োজন চলছে — এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এলাকার সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। গড়ে তুলেছেন মাদক বিরোধী গণকমিটি। বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস সভাপতি এবং রৌশন আল হেলাল ও পবন কুমার পাল যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর কমিটির ডাকে পাঁচ শতাধিক মানুষের এক গণমিছিল পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস ও থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। দাবি জানায়, রানিনগর ব্লকে মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ, হেরোইন, গাঁজা সহ সমস্ত মাদকের ঘাঁটি বন্ধ, অনলাইন লটারি বন্ধ এবং সিনেমা হলে, গ্রামে গ্রামে ভিডিও সিডিতে অশ্লীল ছবি প্রচার বন্ধ করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি এবং ওসি দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর মিছিল রানিনগর বাজার পরিক্রমা করে ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কোন অবস্থাতেই মদের দোকান খুলতে দেওয়া হবে না বলে সভা থেকে ঘোষণা করা হয়।

ভাড়াবৃদ্ধি ঃ পথ অবরোধে লাঠিচার্জ

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে রাজ্য সরকার বাস-ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করলে এস ইউ সি আই তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ঘটে কলকাতায় ৩০ সেপ্টেম্বর। এরপর তা জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়বে।

এদিন হাজরা, এসপ্ল্যানেড ও কলেজ স্ট্রীটে অবরোধ আন্দোলনে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। প্রায় ৫০ জন আন্দোলনকারী আহত হয়। হাজরায় গ্রেপ্তার হওয়া দু'জন এমনই আহত হয় যে পুলিশই তাদের হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। কলেজ স্ট্রীটে এক-একজন আন্দোলনকারীকে তিন-চারজন পুলিশ ঘিরে ধরে রাস্তায় ফেলে লাঠিপেটা করে। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে এখানে প্রত্যক্ষদর্শী পথচারীরা সরব হন।

নবমশ্রেণীর ছাত্রকে পিটিয়ে মারল পুলিশ

গত ২০ সেপ্টেম্বর কয়লা চুরির অজুহাতে বর্ধমান জেলার সালানপুর থানার আছড়া গ্রামের নবমশ্রেণীর ছাত্র জিতেন মণ্ডল ও তার কাকা কার্তিক মণ্ডলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে লক-আপে বর্বর ও পৈশাচিক নির্যাতন চালায় রূপনারায়ণপুর থানার পুলিশ। ফলে লকআপেই মারা যায় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান জিতেন। কার্তিক মণ্ডল গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি জানার সাথে সাথে এস ইউ সি আই চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল জিতেন মণ্ডলের শোকসন্তপ্ত বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানায় এবং পুলিশের এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। দলের বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, আইনের রক্ষকদের এই নিষ্ঠুরতা সভ্যসমাজের কলঙ্ক, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে বিপজ্জনক। মাত্র ১৪ বছরের ছাত্রকে কয়লা চোর অপবাদ দিয়ে পুলিশ লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলল, অথচ প্রকৃত কয়লা মাফিয়ারা পুলিশ প্রশাসন ও সরকারি দলের যোগসাজসে প্রতিদিন এই এলাকা থেকে কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার করছে। তিনি অবিলম্বে খুনি পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও কার্তিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আন্দোলন চলছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সালানপুরে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে

দুর্গাপুর ঃ গত ২৪ সেপ্টেম্বর মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে শহীদবেদী স্থাপন করে প্রীতিলতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ব্যাজপরিধান ও আলোচনা সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রীতিলতা দিবস পালিত হয়।

মায়ের নিকট লেখা প্রীতিলতার চিঠিটি পাঠ করেন প্রধান শিক্ষিকা শিবানী দাশগুপ্তা। প্রীতিলতার আত্মদানের ১৫ দিন পরে মাস্টারদা সূর্য সেন লিখিত 'বিজয়া' প্রবন্ধটি পাঠ করেন কল্পনা ব্যানার্জী। প্রীতিলতা দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন মায়া পাল। প্রীতিলতার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সুচেতা কুণ্ডু। বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলনে নারী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঊষা আচার্য। বহু মানুষ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গভীর আগ্রহ সহকারে বক্তব্য শোনেন।

বালুরঘাট ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে ২৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের আনন্দবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। আজকের এই অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী সমাজে প্রীতিলতার জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলি গ্রহণ করার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ কৃষ্ণা মহন্ত, বাবলি বসাক, নমিতা মহন্ত, নন্দা সাহা প্রমুখ।

ভাটপাড়া ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়ার সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলে এম এস এস ভাটপাড়া শাখার উদ্যোগে শহীদ প্রীতিলতা স্মরণ দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের ব্যারাকপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড রত্না দত্ত বর্তমান সময়ে প্রীতিলতা দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষিকা ভ্রান্তি দাশগুপ্ত প্রীতিলতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রীতিলতার রচনাংশ পাঠ সহ সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়।

রায়গঞ্জ ঃ শহীদ প্রীতিলতা স্মরণে ২৪ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ রোহিনী স্মৃতি নার্সারি বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত শতাধিক মহিলা ও ছাত্র-যুবকদের প্রীতিলতা স্মারক ব্যাজ পরানো হয়। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভারতী রায় প্রীতিলতার জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা নিয়ে বর্তমানের সমাজপ্রগতির আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকলকে আবেদন জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা শিপ্রা কর্মকার, ডি এস ও'র জেলা প্রেসিডেন্ট কমরেড মাধবীলতা পাল এবং ডি ওয়াই ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড বিপ্লব কর্মকার। সভায় সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

বীরভূম ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর সিউড়ি শহরেও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাজপরিধান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রীতিলতা স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ পাঠ করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা চৈতালী চক্রবর্তী। শহীদ স্মরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জেলা সম্পাদিকা ইরা বোস। এদিন কেওটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রীতিলতা স্মরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও যুক্ত হন। প্রীতিলতা সম্পর্কে বক্তব্যের পর স্কুল ছুটি ঘোষণা করা হয়।

১২৫তম রোকেয়া-জন্মবর্ষে বাঁকুড়ায় কনভেনশন

মহীয়সী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করার জন্য মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর একটি নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সুমিত্রা মৈত্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া জেলা সভানেত্রী কমরেড লক্ষ্মী সরকার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। রোকেয়া হোসেনের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস মানুষের মাঝে প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আলপনা মণ্ডলকে সম্পাদিকা ও অঞ্জলি নন্দীকে সভানেত্রী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কাটা লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হল বিদ্যুৎ দপ্তর

কৃষিতে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে হুগলি জেলার কৃষকরাও গত জুলাই মাস থেকে বিলবয়কট চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্দোলনকে ভাঙতে অপপ্রচার থেকে শুরু করে হুমকি, পুলিশি অত্যাচার, লাইন কাটার চেষ্টা সবই চলছে।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর আরামবাগ থানার মায়াপুর-আসানপুর গ্রুপ সাপ্লাইয়ে ৪৩৭ জন বিলবয়কটরত চাষীর বিদ্যুৎ সংযোগ চুপিচুপি ট্রান্সফরমার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর প্রতিবাদে গত ২৮ সেপ্টেম্বর কৃষকরা সাপ্লাই অফিসে জড়ো হন এবং অবস্থা বুঝে স্টেশন ম্যানেজার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজারের গাড়িতে পালানোর চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীরা তাকে অফিসে আসতে বাধ্য করে। অফিসে ঢুকতেই জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং জেলার অন্যতম নেতা মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে শতাধিক কৃষক এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা ঘোষণা করেন লাইন জোড়া না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরামবাগ থানার অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বেলা ১১টা থেকে ঘেরাও চলে। বিকাল ৪টায় স্টেশন ম্যানেজার বয়কটকারী কৃষকদের লাইন জোড়ার দাবি মেনে নেন। এমনকী যাদের বিলবয়কটের আগের কয়েক বছরের বকেয়া রয়েছে তাদের পূর্বের বকেয়া কিস্তি সহ পরিশোধের সুযোগ এবং লাইন জুড়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় যাঁরা আগে আন্দোলনে অংশ না নিয়ে বিল দিচ্ছিলেন তাঁরাও বিল বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন। গোটা আরামবাগ মহকুমায় এই আন্দোলন প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

বীরভূম

লাইন কেটে আন্দোলনের চাপে আবার তা জুড়ে দিতে বাধ্য হল বীরভূমের বিদ্যুৎ দপ্তর। কৃষিতে অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে অ্যাবেকার ডাকে জুলাই মাস থেকে বিদ্যুৎগ্রাহকরা বিল বয়কট চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নেই, সুতরাং তাদের পক্ষে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল দেওয়া সম্ভব নয়। কৃষকদের এই প্রতিবাদকে কোন মূল্য না দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর লাইন কেটে দেয়। এই ঘটনা কৃষকদের ক্ষোভানলে ঘৃতাহুতি দেয়। ২০ সেপ্টেম্বর তিন সহস্রাধিক কৃষক বীরভূমের এস ই দপ্তর ঘেরাও করে। দু'ঘণ্টা ঘেরাও থাকার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কাটা লাইন জুড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। এরপর মিছিল যায় জেলা শাসকের দপ্তরে। কৃষকদের পক্ষ থেকে সার-বীজ নিয়ে কালোবাজারি বন্ধ করার এবং সরকারকে সরাসরি ধান কেনার দাবি করা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মদন ঘটক, নুরুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, অসিত মজুমদার প্রমুখ।

কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে জেলাশাসকের অফিস অবরোধ করে বিদ্যুৎগ্রাহক চাষীদের বিক্ষোভ

সমস্যাজর্জরিত কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে কে কে এম এস

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ গ্রামবাংলার যে গরিব চাষীরা সিপিএম ফ্রন্ট সরকারকে বিশ্বাস করেছিল আজ তারা আতঙ্কিত। আতঙ্কিত এই কারণে যে তাদের জমিজমা বাস্তুভিটা কেড়ে নিয়ে সরকার শিল্পায়নের নামে ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে দিতে চলেছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, বারুইপুর প্রভৃতি এলাকায় জমি বেচাকেনা বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় চাষীরা হতচকিত, ক্ষুব্ধ। তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে রোখবার জন্য। এস ইউ সি আই কর্মীরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন, কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস যোগাচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে চলছে বৈঠক, পথসভা, জনসভা। ১৫ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণপুরে, ১৬ সেপ্টেম্বর অর্জুনায়, ১৭ সেপ্টেম্বর গৌড়দহে কৃষক বৈঠক হয়। সর্বত্রই ১০০/১৫০ করে চাষীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জয়কৃষ্ণনগর স্কুল মাঠে হয় জনসভা। ২০ সেপ্টেম্বর ক্যানিং-এর টাইনিটট বিদ্যালয়ে হয় নাগরিক কনভেনশন। গঠিত হয় 'গরিব বাঁচাও চাষী বাঁচাও' কমিটি। এই কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সেকেন্দার জমাদার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইয়াহিয়া আখন্দ, আহ্লাদ মোল্লা, অরূপ নাথ, বাদল সরদার প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা চাষী বাঁচাও কমিটির অন্যতম নেত্রী এবং এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। অরূপ নাথকে সভাপতি ও ইয়াহিয়া আখন্দকে সম্পাদক করে ৪০ জনের কমিটি হয়। চাষী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে চাষী বাঁচাও কমিটি গড়ে তোলার জন্য দলের স্থানীয় সংগঠক কমরেডস্ প্রতাপ নস্কর, পালান হালদার, প্রাণতোষ নস্কর, সামসুদ্দিন নস্কর, পালান মণ্ডলেরা গ্রামীণ সভাগুলিতে বক্তব্য রাখছেন। সর্বত্রই চাষীরা বলছে, 'জানি আপনারা ছোট দল, আপনাদের মন্ত্রী নেই, এমএলএ মাত্র দু'জন, অনেক আক্রমণও আপনাদের উপর হচ্ছে, তবুও আপনারাই লড়েন, মার খান। আপনাদের কর্মীরাই মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, ছেড়ে পালায় না।' বোঝা গেল চাষীরা বলতে চাইছে ইংরেজি চালুর দাবিতে দীর্ঘ ১৯ বছরের আন্দোলনের কথা। বোঝা গেল, এস ইউ সি আইকে পেয়ে কৃষকরা যেমন পাচ্ছে লড়াইয়ের শক্তি, তেমনি কৃষকদের পেয়ে এস ইউ সি আই আন্দোলনকে তীব্রতর করছে।

মালদহ ঃ সার-বীজ-বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া অথচ কৃষিফসলের দাম কমে যাওয়ার ফলে কৃষকরা আজ চূড়ান্ত সর্বনাশের মুখে। এর বিরুদ্ধে কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর ১৩ দফা দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও অফিসের সামনে সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই হরিশ্চন্দ্রপুর থানা কমিটির সম্পাদক কমরেডস্ রবীন্দ্র রাম, মনোজ রাম প্রমুখ। এ আই কে কে এম এস-এর থানা সম্পাদক কমরেড মহঃ রেকিবের নেতৃত্বে ডেপুটেশন হয়। তুলসিহাটা, মহেন্দ্রপুর, রসিদাবাদে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার দাবিও জানানো হয়। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁর তরফে চেষ্টা করার আশ্বাস দেন।

কোচবিহার ঃ ১৮ বিঘা পর্যন্ত জমির সব ধরনের ট্যাক্স মকুব, দরখাস্তের উপরে ৫ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগানোর বিধান প্রত্যাহার, ব্লকের জলাভূমি সংরক্ষণ ও তাতে মাছ ধরার লাইসেন্স বিনামূল্যে বিতরণ, তিস্তার বাহাতি খাল দ্রুত চালু করে সেচের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুতের দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে হলদিবাড়ি বি এল এল আর ও-র নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৫ শতাধিক কৃষকের মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বাসস্ট্যান্ড মোড়ে সালিম ও তার নয়া দোসর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কুশপুতুল দাহ করে কৃষকরা সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়ার প্রতিবাদ জানান। বক্তব্য রাখেন দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড রুহুল আমিন।

আন্দোলনের চেতনায় প্রাণবন্ত কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের রাজ্য কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজ যেন আবার জাগছে। এক সময় তেভাগা আন্দোলন সহ কৃষকদের বহু আন্দোলন এই রাজ্যে হলেও সিপিএম ক্ষমতায় গিয়ে কৃষক আন্দোলনকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। 'আমরা বামফ্রন্ট এখন ক্ষমতায়, এখন লড়াই আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, তোমাদের প্রয়োজন আমরাই মেটাব' এই বলে সিপিএম দীর্ঘ ২৭/২৮ বছর ধরে গ্রামবাংলার সরল বিশ্বাসী কৃষকদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। কিন্তু কৃষি বিদ্যুতের ব্যাপক মাশুলবৃদ্ধি, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়ার জন্য কৃষক উচ্ছেদের সরকারি তৎপরতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে কৃষকরা। সিপিএম নেতাদের স্তোকবাক্য শুনে তারা আর আশ্বস্ত থাকতে পারছে না, তাদের প্রতি ভরসা রাখতে পারছে না। তারা আন্দোলন চাইছে কারণ আন্দোলন না করলে সবই যাবে। তাই কৃষকরা এসেছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সস্টিটিউট হলে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন (কেকেএমএস) আয়োজিত রাজ্য কনভেনশনে। তারা একটা দিশা পেতে চায়। কৃষকদের অধিকার কীভাবে রক্ষা পাবে তা জানতে চায়।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জাকিমুদ্দিন সেখ। প্রস্তাবের সমর্থনে উত্তর ২৪ পরগণার কৃষক নেতা কমরেড গোপাল বিশ্বাস বলেন, ডিজেলের দামবৃদ্ধির জন্য সরকার বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছে, কৃষককে বাড়তি দামে ডিজেল কিনতে হচ্ছে, সরকার কৃষি ফসলের দাম বাড়াচ্ছে না। এই সরকার তাহলে কার সরকার, প্রশ্ন তোলেন তিনি। হরিণঘাটা, স্বরূপনগর, হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বহুজাতিক কোম্পানি, সরকার, সুদখোর মহাজন, ফড়ে পাইকার প্রভৃতির কবলে পড়ে চাষী কীভাবে ঠকছে, লুণ্ঠিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে তা প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন রাজ্য কৃষক নেতা কমরেড শঙ্কর ঘোষ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, লড়তে গেলে শত্রুকে চিনতে হবে। এই শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ, আর তাকে রক্ষা করছে সরকার, পুলিশ, মিলিটারি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে কীভাবে মানুষ শোষিত হচ্ছে কমরেড মুখার্জী তা তুলে ধরেন।

এই কনভেনশন আগামী ১৪ নভেম্বর ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশের ডাক দিয়েছে। এই সংগঠনের সঠিক নীতি-আদর্শভিত্তিক আন্দোলন সিপিএমের বহু পুরানো কর্মীকে আকর্ষণ করছে। তাঁদের অনেকে এই কনভেনশনে এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন নদীয়ার আয়ুব আলি জানালেন, আমি '৬২ সাল থেকে প্রথমে সিপিআই পরে সিপিএম করি। দলের এক নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিদ্যুতের এত দাম বাড়ছে, ফসলের দাম নেই, কৃষক বাঁচবে কী করে? সেই নেতা আমাকে তিরস্কার করে বলেন, ''এত ক্লাস করে কী শিখেছ, এসব বাইরে বলছ কেন?'' বোঝাই যাচ্ছে, কৃষকদের প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারছে না সিপিএম নেতৃত্ব। দেবেই বা কীভাবে? যারা শোষক, তাদের পক্ষে দাঁড়ালে শোষিতের হয়ে যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় না! আয়ুব যখন বলছিলেন কৃষকজীবনের যন্ত্রণার কথা, তখন মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় অন্যান্য কৃষকেরা।

তিনি কৃষকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''ভীড় বাসে উঠবেন না, বাস ফাঁকা হলেও যে বাস সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে সেই বাসে উঠুন।'' এ ভাষাতেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনও সংগঠনে ভীড় দেখেই তাকে সঠিক মনে করা ঠিক নয়। ভীড় কম থাকলেও পথ ও লক্ষ্য যার ঠিক, সেই পারবে কৃষকদের সঠিক পথ দেখাতে। যার সন্ধান তিনি পেয়েছেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের মধ্যে। লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষায়, সহমর্মিতায়, কথোপকথনে চাষীদের এই কনভেনশন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনমুখী মেজাজ স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল।

কনভেনশনে উপস্থিত কৃষকদের একাংশ

জয়নগর ২নং ব্লকের বিডিও নগ্নভাবে সিপিএমের হয়ে কাজ করছেন

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা আজ এরাজ্যে অলীক কল্পনার বস্তু। একজন বিডিও কত নির্লজ্জভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শিবাজী রায়। এই নির্লজ্জ দলবাজির বিরুদ্ধে এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার দাবিতে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ব্লক অফিসে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দশটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। প্রতিনিধি দলের নেতা, এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার বিডিও'র সাথে আলোচনা করে এসে জানালেন, পর পর ঘটে যাওয়া ৯টি ঘটনা আমরা তাঁর কাছে তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছি, তিনি বেতনভুক সরকারি কর্মচারী হয়ে সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের উমেদারি করে চলেছেন। প্রথমত, সাম্প্রতিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এস ইউ সি আই প্রভাবিত এলাকা বলে ত্রাণসাহায্যের দাবি তোলামাত্র তিনি বলেন, যেসব জমিবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার দাগ নম্বর ও খতিয়ান নম্বর দিতে হবে। যদি প্রমাণিত হয়, সেগুলি বেআইনি দখল নয়, তবেই ত্রাণ পাঠানো হবে। আইনি-বেআইনি প্রশ্ন তুলে বিডিও প্লাবিত এলাকার মানুষদের কাছে ত্রাণ পাঠানোর মানবিক কর্তব্যও ভুলে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, দু'বছর আগে মণিরতট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সিপিএম প্রধান সফিউল্লা মোল্লা তিন লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ব্লক অডিট ও এজি অডিট রিপোর্টে স্পষ্টভাবে প্রধানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পাবলিক-মানি আত্মসাৎ করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন এক অদৃশ্য নির্দেশে বিডিও মহাশয় নিশ্চল প্রস্তরবৎ নীরব থেকে যাচ্ছেন।

তৃতীয়ত, গড়দেওয়ানী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সিপিএম প্রধান মেহেবুবা মোল্লা স্কীমের কোন কাজ না করেই ব্লক অফিস থেকে টাকা ও চাল তুলে নেন। নতুন এস ইউ সি আই প্রধানকে দায়িত্ব হ্যান্ড-ওভার করার সময় তার কোন হিসাব উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। অডিট রিপোর্টেও কোন উল্লেখ নেই। ডিলারের কাছে চাল আটকে দিয়ে বিডিওকে এই আর্থিক নয়-ছয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বার বার আবেদন করা হয়, কিন্তু তিনি অদ্ভুত নীরবতা পালন করেন।

চতুর্থত, বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্দিরা আবাসের টাকা পাননি বলে জনৈক সিপিএম সমর্থক অভিযোগ জানানোর সাথে সাথে তার অভিযোগ সঠিক কিনা পঞ্চায়েতের নথিপত্র তদন্ত না করেই বিডিও একতরফাভাবে এস ইউ সি আই সদস্য আজিজুল পুরকাইতের বিরুদ্ধে এফ আই আর করলেন এবং গ্রেপ্তার করালেন। এক্ষেত্রে অতি তৎপর হতে তাঁর বিন্দুমাত্র দেরি হল না।

পঞ্চমত, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান ভারতী পাইককে অপসারণের জন্য আহূত একাধিক মিটিং-এ বিরোধী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নানা অজুহাতে মাইনরিটির সমর্থনপুষ্ট সেই প্রধানকে বহাল রেখেছেন। বাধ্য হয়ে বিরোধীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কোর্ট প্রধানকে নির্দেশ দেয় আস্থা ভোটের জন্য পুনরায় মিটিং ডাকতে। প্রধান বিডিও'র সাথে পরামর্শ করে সেই মিটিং-এ অনুপস্থিত থাকলেন এবং নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন — 'নানা কারণে মিটিং বাতিল করা হয়েছে।' ব্লক অফিস থেকে একজন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে পুনরায় সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হয় এবং ব্লকে জমা দেওয়া হয়। এতেও বিডিও মহাশয় নির্বাক, নিশ্চল। এর অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় কি?

ষষ্ঠত, গড়দেওয়ানী গ্রাম পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই সদস্যা মাতুজান মণ্ডলকে সিপিএম বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রলোভন দিয়ে গোপনে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভিন্ন অঞ্চলে লুকিয়ে রাখে এবং তার সমর্থন নিয়ে পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। বিডিও অত্যন্ত তৎপতার সাথে সেই অনাস্থা বৈঠক যাতে সফল হয় তার জন্য ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করে এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত প্রধান নিরঞ্জন সর্দারকে অপসারণের কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত আইনের ২১৩(ক) ধারা বলে মাতুজান মণ্ডলের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা দেওয়া সত্ত্বেও বিডিও মহাশয় 'দেখছি দেখব' বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন, এমনকী রিটার্নিং অফিসার এসডিও'র কাছে লিখিত ডকুমেন্টগুলিও পাঠাননি।

সপ্তমত, পঞ্চায়েত সমিতির তফসিলি রিজার্ভ সীটে সিপিএমের গৌরী গায়েন নির্বাচিত হন। ব্লক থেকে তাকে তফসিলি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পরে জানা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, তিনি তফসিলি জাতিভুক্ত নন। দু'বছর আগে লিখিতভাবে এই অভিযোগ জানানো হয়েছে। জালিয়াতি করে একজন ব্যক্তি সর্বসমক্ষে নির্বাচিত সদস্যের অধিকার ভোগ করে যাচ্ছেন বিডিওর বদান্যতায়।

অষ্টমত, জয়নগর ২ পঞ্চায়েত সমিতি এস ইউ সি আই দ্বারা পরিচালিত হয় — এই অপরাধে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্লক অফিসের অসহযোগিতা ভীষণভাবে কাজের ক্ষতি করছে। নিয়ম হচ্ছে যেকোন স্কীমের কাজ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে লেবার পেমেন্ট করতে হয়। অথচ কাজ হয়ে যাওয়ার ছ'মাস পরেও শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া যাচ্ছে না। যিনি পে-মাস্টার হন, তাঁকে শ্রমিকদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। ব্লক অফিসের এই পরিকল্পিত দীর্ঘসূত্রিতার জন্য দায়িত্বশীল কেউ পে-মাস্টার হতে রাজি হন না।

নবমত, মাথাপিছু রেশনকার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও আজও বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এদেশে জন্মেও মৃত্যুর আগে তাদের একটি প্রাথমিক সরকারি স্বীকৃতিপত্র জোটেনি। রেশনিং ব্যবস্থা তো সরকার আগেই তুলে দিয়েছে। কিন্তু রেশন কার্ড হল, কোন ব্যক্তি এদেশের মানুষ কি না তার একটি পরিচয়পত্র। ন্যূনতম সেই সুযোগটুকু মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্লকের ঘোরতর আপত্তি।

ব্লক অফিসের সামনের রাস্তায় একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিডিও'র পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জননেতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষকনেতা কমরেড গোবিন্দ আহিরী, ছাত্র নেত্রী কমরেড ফিরোজা হালদার, যুব নেতা কমরেডস জয়নাল গাজী, হরিদাস নাইয়া ও জাকির খাঁ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কৃষক নেতা কমরেড অমূল্য মণ্ডল। সবশেষে সভামঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিডিও যদি তার এই নিকৃষ্ট পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করেন তাহলে একমাস পরে এই ব্লক অফিসেই হাজার হাজার মানুষের সামনে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

মুম্বাই বন্যা — প্রোমোটাররাজের পরিণাম

উন্নয়নের নাম করে রাজ্যে রাজ্যে মাথা তুলছে উপনগরী। চাষীর জমি, পুকুর, বাস্তু, বাগান ধ্বংস হচ্ছে নির্বিচারে। নির্বিচারে নিকাশি নদী, সমুদ্রতট ভরিয়ে ফেলা হচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে তার ম্যানগ্রোভ অরণ্য (গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্র, হ্রদ বা নদীতীরের কাদামাটিতে জাত একধরনের গাছের বন; এই গাছগুলির বহু জট পাকানো শিকড় মাটি ফুঁড়ে উঁচু হয়ে থাকে।)। পরিণতিতে সমাজের উপর নেমে আসছে ধ্বংসের করাল আঘাত। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে (২৬-২৮ জুলাই) মুম্বইয়ের প্রলয়ঙ্করী বন্যা, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দেড় সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু, ৭৫ হাজার হেক্টর জমি জলকাদায় চাপা পড়া এবং সরকারি-বেসরকারি স্তরে অন্তত ১৪ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির লোকসান — এই সত্যই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল।

পাহাড় ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করে যথেচ্ছভাবে উপনগরী গড়ে তোলার বিরুদ্ধে পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানীরা গত প্রায় এক দশক ধরে যে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছেন, মুম্বাইয়ের প্রলয় তাকেই সত্য প্রমাণ করল। মুম্বাই ও নয়া মুম্বাই-এর যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চলের আয়তন ১৯২৪ সালে ছিল ২৩৫ বর্গকিলোমিটার, ১৯৯৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬০ বর্গকিলোমিটারে। ২০০০ সালে আরও ১০০ হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে। তারপরেও আরও ধ্বংস করা হয়েছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই 'সমুদ্রোপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৯১)' চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের পূর্বেকার শিবসেনা-বিজেপি সরকার এবং বর্তমানের কংগ্রেস সরকার এই সমুদ্রোপকূল নিয়ন্ত্রণ আইনকেও সঙ্কুচিত করে প্রমোটারদের যথাসম্ভব সুবিধা করে দিচ্ছে। বম্বে এনভায়রনমেন্ট অ্যাকশন গ্রুপ-এর পক্ষে শ্যাম চেইনানি বলেছেন, 'সবুজ এলাকা স্পঞ্জ হিসেবে কাজ করে, তারা জল শুষে নেয় ও জমা জল নির্গমণ ঘটায়; সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত। ফলে গত সপ্তাহে যা ঘটেছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই" (সূত্র ঃ টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ৩-৮-০৫)। ষাটের দশক থেকে আন্তর্জাতিক প্রমোটাররা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহরকে হংকং বা সিঙ্গাপুরের বিকল্প পশ্চিমী টুরিস্টদের মনোরঞ্জন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই সম্ভাব্য টুরিস্ট স্পটগুলির অন্যতম মুম্বাই। অতএব শুরু হয় প্রমোটাররাজের খেলা; আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র, সরকারি প্রশাসন ও প্রমোটারবাহিনীর সম্মিলিত হামলা। পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয় একের পর এক দাঙ্গা, তার আড়ালে শুরু হয় মুম্বাইয়ের বড় বড় কারখানার সংগঠিত শ্রমিকদের বিতাড়ন। তারপর সেই কারখানার জমি চলে যায় প্রমোটারদের হাতে। গত ২০ বছরে বিভিন্ন কারখানা বন্ধ করে দিয়ে এমন ৬০০ হেক্টর জমি বের করে 'নগরোন্নয়ন' করা হয়েছে — ফ্ল্যাট বাড়ি, হোটেল, শপিং মল, অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্ট, বার এমনি আরও কত কী! লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়ে যাবে কোথায়? শহরাঞ্চলের গরিব মানুষও বিতাড়িত। এদের সবার ঠাঁই দিতে নিচু এলাকাগুলোয় গড়ে ওঠে বস্তির পর বস্তি। শহরের গা ঘেঁসে 'মিথি' নামের যে ছোট নদীটি আরব সাগরে এসে পড়ত, 'মাহিম ক্রিক' নামের যে জলধারা প্রবাহিত হত — বান্দ্রা কুরলা শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার অজুহাতে তাদের মুখ দেওয়া হল বন্ধ করে। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পরিণতিতে দেখা গেল শহরের জল বেরোবার রাস্তা নেই। ফলে বৃষ্টি শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তাগুলো হয়ে যায় উথালপাথাল নদী। অবরুদ্ধ জলরাশি এবার বেরোবার জন্য দুর্বল জায়গা খোঁজে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাই সাকিনার, কুরলা, পূর্ব আন্ধেরি ও মাহিম এলাকা ভেঙে নিয়ে বেরিয়ে যায়। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১-৮-০৫)

মুম্বাইয়ের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যে শিক্ষা রেখে গেল, তথাকথিত আধুনিকতার ধ্বজাধারীদের তাতে টনক নড়বার কথা নয়। টাকা — আরও টাকার লোভ, মুনাফা — অতি মুনাফার ব্যাধি তাদের রক্তে-মাংসে-হাড়ে-মজ্জায়। আমাদের পশ্চিমবাংলায়ও আমরা নগরোন্নয়নের উন্মত্ততা দেখছি। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সমস্ত জলা-জমি, জল নিকাশি ভরিয়ে ফেলে বিশাল বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি মাথা তুলছে। সরকার বলছে — আবাসন শিল্প। এই আবাসন শিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রমোটার ও দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিক এবং সরকারি নেতামন্ত্রীদের এক অশুভ জোটবন্ধন। বহু প্রবহমান নদীকে ইঁটভাটা সহ নানা কাঠামো তৈরি করে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, পলিজমা নদীগুলোর সংস্কার হচ্ছে না; দক্ষিণ ২৪ পরগণার স্রোতস্বিনী পিয়ালি নদীকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং হুকাহারানিয়া নদীতে বাঁধ তুলে কার্যত হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। সুন্দরবনের বিশ্বখ্যাত ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া সুন্দরবনের নদী-সমুদ্র ও নদী-উপকূলভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অত্যাধুনিক 'ট্যুরিস্ট স্পট' গড়ে তোলার আয়োজন চলছে, পাঁচতারা-সাততারা হোটেল, ফ্লোটেল (ভাসমান হোটেল), অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্ট, বার, সুইমিং পুল, আরও কত কী গড়ে উঠবে; অতএব চাষীদের চাষের জমি ও বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদ কর, মৎস্যজীবী লক্ষ লক্ষ মানুষের মাছ-কাঁকড়া ধরার অধিকার কেড়ে নাও। সাহারা কোম্পানির সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হবে নগরোন্নয়ন; করবে ইন্দোনেশিয়ার পুঁজিপতি সালিম গোষ্ঠী। এদেরকে জমি দিতে সরকারি ফতোয়া — ৫১০০ একর জমি চাই। কিন্তু আলাদা জমি কোথায়? সর্বত্রই তো এক-ফসলি, দো-ফসলি চাষের জমি, বাস্তুবাড়ি, বাগান। তাতে কী! 'বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে'; চাষীর হাতে কিছু থোক টাকা ধরিয়ে দেব — বিদেয় হও। কোথায় যাবে — কী করে বাঁচবে জানি না। তবু পুঁজির মালিক ও বহুজাতিকদের মুনাফা শিকারের ব্যবসা চলবে। এরই নাম পুঁজিবাদ। শুধু মানুষকে শোষণ করাই নয়, পরিবেশকে ধ্বংস করা তার ব্যবসার অঙ্গ। তার সেবাদাস সরকারগুলো তাদের এই লুঠের শকট চালাবার পথ যথাসম্ভব মসৃণ করে দিচ্ছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বোঝাচ্ছে — এর নাম উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন। পুঁজিপতিদের একাজ করতে দিয়ে বিনিময়ে নেতামন্ত্রীদের পকেটে ঢোকে বিপুল অঙ্কের কাটমানি এবং নেতামন্ত্রীরা পান ক্ষমতার মসনদে থাকবার গ্যারান্টি।

আশার কথা, মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। সুন্দরবনের প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ও জনজীবনকে বিপন্ন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার গড়ে তুলতে চেয়েছিল পারমাণবিক চুল্লি। মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দিয়েছে। সাহারা কোম্পানি সুন্দরবন লুণ্ঠনের যে চুক্তি করেছিল রাজ্য সরকারের সঙ্গে, সেই চুক্তিও গণপ্রতিরোধের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। জীবন্ত হুকাহারানিয়া নদীকে বেঁধে দিয়ে মেছোঘেরি বানাবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও মানুষ রুখে

আটের পাতায় দেখুন

গদিলোভী দল ও নেতাদের ঘৃণ্য ভূমিকা বিহারের গরিব জনগণের উপর আবার একটা নির্বাচন চাপিয়ে দিল

নতুন করে বিহার বিধানসভার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসেই বিহারে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছিল, কিন্তু সরকার গঠিত হতে পারেনি। শাসন ক্ষমতার দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থ এবং গদির জন্য ব্যক্তিগত লোভ থেকে বিধায়কদের নির্লজ্জ ভূমিকাই বিহারের দরিদ্র জনগণের ওপর আর একটি বিরাট খরচ-সাপেক্ষ নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছে। দেশের দরিদ্রতম রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার একটি। গোটা দেশে দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা সরকারি হিসাবে যেখানে ২৬%, সেখানে বিহারে ৪২%। রাজ্যের ৩৪% লোকের কোন সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা নেই। মাত্র ২০% মানুষের পাকা বাড়ি আছে। ৪৫% লোকের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। মাত্র ২০% মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পান। জনগণ বন্যা-খরায় বিপর্যস্ত। এইরকম দুরবস্থার মধ্যে থাকা জনসাধারণের ঘাড়ে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর মদতপুষ্ট দলগুলি এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা।

এই নির্বাচন কি অনিবার্য ছিল? বিগত নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রে গদির লোভে জোটবদ্ধ ইউপিএ'র শরিক দলগুলি যদি বিহারে ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে জনতাকে আর একটা ব্যয়বহুল নির্বাচনের বোঝা বহন করতে হতো না। গত নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে দলগুলির অবস্থা ছিল এইরকম ঃ - বিজেপি - জনতা দল (ইউ) ৯৩, রাষ্ট্রীয় জনতা দল - ৭৫, লোকজনশক্তি পার্টি-২৯, কংগ্রেস - ১০, সি পি আই-সিপিএম-সিপিআই-এমএল (লিবারেশন) এবং অন্যান্য - ৩৬।

উপরোক্ত হিসাব থেকে একথা পরিষ্কার যে, সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে রোখার নামে কেন্দ্রে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জোট নির্মাণকারী রাষ্ট্রীয় জনতা দল, কংগ্রেস, লোকজনশক্তি পার্টি, সিপিআই, সিপিএম, বিহারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সহজেই সরকার গঠন করতে পারত। বিহার নির্বাচনের সময় এই দলগুলি তো উগ্র সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার নীতি অনুসরণ করে নিজেদের মিলিত সরকার গঠনের কথাও বলেছিল। ভোটের পর সে কথা ভুলে গেল কেন? আসলে নীতি ও আদর্শের কথা এইসব দলগুলির কাছে নিছক ভোট জোগাড়ের কৌশলমাত্র। কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকার গঠনের সময় বাইরে নীতির বুলি, আর ভিতরে মন্ত্রীত্ব পাওয়া নিয়ে যে কোন্দল চলেছিল, শেষপর্যন্ত আপসরফা করে সেটা মিটিয়ে ইউ পি এ সরকার গঠন সম্ভব হলেও, বিহারে সরকার গঠন সম্ভব হল না। তার কারণ, বিহারে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পদ পাওয়া নিয়েই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, যা মেটানো সম্ভব হয়নি।

বস্তুত, কেন্দ্রে ইউ পি এ'র অন্তর্গত দলগুলির বিজেপি-বিরোধিতার মধ্যে কোনও নীতি আদর্শের প্রশ্ন যে আদৌ নেই, তা গত ১ বছরের ইউ পি এ শাসনেই পরিষ্কার। আর্থিক নীতি, বিদেশ নীতি, প্রশাসন পরিচালনার নীতি প্রভৃতি কোন বিষয়েই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ'র সঙ্গে সিপিআই-সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএর কোন পার্থক্য নেই।

সিপিআই-সিপিএম যে কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট দেয়, সেই কংগ্রেস শাসনেই আলিগড়, মেরঠ, মুরাদাবাদ, রাউরকেলা, জামশেদপুর, ভাগলপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দাঙ্গা হয়েছে। আসামে নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িকতার খেলা খেলবার জন্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রত্যাহার করে নিয়ে নেলী হত্যাকাণ্ডের রাস্তা কংগ্রেসই খুলে দিয়েছিল। স্বয়ং রাজীব গান্ধী বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জমি তৈরি করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে দিল্লিতে শিখবিরোধী দাঙ্গা করিয়েছিল। অথচ শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় বিজেপির বিকল্প হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য তথাকথিত বামপন্থীরা এই কংগ্রেসের গায়েই ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল লাগিয়ে দিয়েছে। যেনতেন প্রকারেণ গদি দখল করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করাই যে এর মূল উদ্দেশ্য, তা বিহারের বিগত নির্বাচনেও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালুপ্রসাদ যাদবের সাথে হাত মিলিয়ে সরকার চালানো সত্ত্বেও কংগ্রেস বিহারে লালুপ্রসাদের দীর্ঘ শাসনে সৃষ্ট জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে সেই রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। যদিও তার আগের নির্বাচনে, এমনকী লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সঙ্গেই জোট করে লড়েছিল। অপরদিকে কেন্দ্রের জোট সরকারের অপর এক শরিক রামবিলাস পাসোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি গত বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের দলিত ভোট-ব্যাঙ্কের সাথে বিশেষ করে উচ্চবর্ণের কুখ্যাত মাস্‌লম্যানদের সঙ্গে নিয়ে উচ্চবর্ণের ভোট আদায় করে ক্ষমতা দখল করার আশায় লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নেমেছিল। গত নির্বাচনে এই লোকজনশক্তি পার্টির সঙ্গেই কংগ্রেস আসন সমঝোতা করেছিল। এর ফলেই সুরজভান সিংহ, মুন্না শুক্লার মতো কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের মদতে লোকজনশক্তি পার্টি গত নির্বাচনে ২৯টি আসন দখল করে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে দেখা দেয়।

নির্বাচনের পরে গদির লোভে নতুন খেলা শুরু হয়ে যায়। ক্ষমতা করায়ত্ত করার লোভে কংগ্রেস পাসোয়ানের ওপর সরকার গড়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কারণ লালুপ্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তার পক্ষে অন্য দল থেকে এম এল এ ভাঙানো বা লোকজনশক্তি পার্টির সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল না। অথচ রামবিলাস পাসোয়ান কোনমতেই লালুপ্রসাদকে সমর্থন করবেন না। আবার ধর্মনিরপেক্ষ ভান বজায় রাখার জন্য বিজেপি-জনতা দল (ইউনাইটেড) জোটের সাথেও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় চাপে পড়ে রামবিলাস পাসোয়ান বলেন যে, যদি নীতিশকুমার এনডিএ ছেড়ে আসেন, তাহলে কংগ্রেস, লোকজনশক্তি পার্টি, জনতা দল (ইউ)কে সাথে নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করবে। রামবিলাস যে লালুপ্রসাদকে সমর্থনে রাজি নয়, সেটা ইতিমধ্যেই সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে সুযোগ বুঝে বিজেপি, জনতা দল(ইউ) জোটও সরকার গঠনের জন্য এমএলএ কিনতে, অর্থাৎ ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ে, সুযোগ পেতেও দেরি হয় না।

সরকার গঠনে টাল-মাটাল অবস্থা, দ্রুত সময় চলে যাওয়া এবং হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কায় লোকজনশক্তি পার্টির বিধায়করা অস্থির হয়ে ওঠেন। কারণ কোনও নীতি নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাঁরা রাজনীতিতে এসেছেন। মন্ত্রী হওয়া বা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করাই এই রাজনীতি ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। এই কারণেই এদেশে বিধায়ক কেনা-বেচা বর্তমানে প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস, বিজেপি কেউই এর থেকে মুক্ত নয়। এই অবস্থায় রামবিলাস পাসোয়ান বুঝতে পারেন যে, লোকজনশক্তি পার্টির বিধায়কদের বিজেপি কিনতে শুরু করেছে এবং তাঁর পার্টি ভাঙছে। ফলে, তিনি লালুপ্রসাদকে শর্ত দেন যে, যদি কোন মুসলিমকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়, তাহলে তিনি আর জে ডিকে সমর্থন করবেন। অর্থাৎ রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে হটিয়ে লালুবিরোধী জনতাকে খুশি করা এবং মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক দখল করা — এই ছিল পাসোয়ানের চাল। কিন্তু রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রী রাখার প্রশ্নে লালুপ্রসাদ অনড় থাকলেন, সরকারি ক্ষমতার ওপর থেকে লালুপ্রসাদ নিজের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত দখলদারি ছাড়তে রাজি হননি। এই অবস্থায় যখন কংগ্রেস বিহারে ফায়দা তুলতে পারছে না, তখন বিজেপি টাকার থলি ও মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখিয়ে ময়দানে নেমে পড়ে এবং লোকজনশক্তি পার্টির ক্ষমতালোভী বিধায়কদের ভাঙানোর জন্য তাদেরকে নিজেদের শাসিত রাজ্য ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যায়।

বিধায়কদের ভাঙিয়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করে নেবে, বাস্তবে এ ধরনের পরিস্থিতি বা সম্ভবনা দেখা দেওয়া মাত্রই কংগ্রেস গণতন্ত্রের পোষাকটাকে তড়িঘড়ি ঝেড়ে ফেলতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাচ্ছে দেখে দরিদ্রতম বিহার জনতার স্বার্থকে পায়ে মাড়িয়ে নিছক দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে তৎক্ষণাৎ রাজ্যপালকে ব্যবহার করে কলমের খোঁচায় তিনমাস ধরে জিইয়ে রাখা বিধানসভাকে তড়িঘড়ি ভেঙে দেয়। বিজেপি'র বিরুদ্ধে বিধায়ক কেনাবেচার যে অভিযোগ কংগ্রেস তুলেছে, সে কাজ অত্যন্ত গর্হিত এবং নিন্দনীয়। কিন্তু কংগ্রেসের মুখে একথা শোভা পায় কি? শুধু কংগ্রেস কেন, কোন ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী সংসদীয় রাজনৈতিক দলই কি আজ এর থেকে মুক্ত? গোটা বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতি শুধু নয়, বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও চরম পচন ধরেছে। যেকোন উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার তাগিদে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কোন তোয়াক্কা না করে জাল ভোট থেকে শুরু করে গায়ের জোরে বুথ দখল করা, ক্রিমিনালদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা, এম এল এ কেনাবেচা কোন কিছুই তাদের ক্ষেত্রে বাদ যাচ্ছে না। পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় এদেশে সংসদীয় নির্বাচন শুরু থেকেই সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না। কিন্তু তবুও নির্বাচনে জনমত প্রতিফলিত হওয়ার যতটুকু সুযোগ শুরুতে ছিল, পুঁজিবাদ যত গভীর থেকে গভীরতর সংকটে ঢুকেছে তত সে ভোটসহ জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কাগজে লিপিবদ্ধ রাখা ছাড়া বাস্তবে কেড়ে নিয়েছে। বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। এই কংগ্রেসই নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকারে আসীন হওয়ার সময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে কিছু সাংসদ কেনেন নি কি, যার মধ্যে ঝাড়খণ্ডের শিবু সরেন এবং অন্যদের টাকা নেওয়ার ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে। শিবু সরেনের ঘটনা তো আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে বিধায়ক কেনাবেচা বন্ধ করার যে কথা কংগ্রেস বলছে তা ছলনা মাত্র। আসলে বিহারের শাসনক্ষমতা বিজেপি যেন কব্জা করতে না পারে এবং নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ যেন খোলা থাকে — এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস রাজ্যপালকে দিয়ে বিহার বিধানসভা ভাঙিয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বিহারের জনগণের। লালু-রাবড়ি সরকারের অপশাসনকে খতম করে সুশাসন এবং ভ্রষ্টাচারমুক্ত সরকার লাভের তাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্খা তো পূরণ হয়ইনি, বরং আরও একটি নির্বাচনের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এমন হল? এটা এজন্যই হয়েছে যে, লালু-রাবড়ি সরকারের দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের পথে না গিয়ে সংসদীয় পথ ধরেই, মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী, দুর্নীতিতে লিপ্ত, ক্ষমতালোলুপ পার্টির বিকল্প হিসাবে মালিকশ্রেণীরই স্বার্থরক্ষাকারী অপর একটি দলকে নির্বাচিত করেছে, যারা ভ্রষ্টাচার এবং ক্ষমতালোলুপতায় লালুপ্রসাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

যদি জনগণ একটু ভাবতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, এই বিহারে কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন সরকারি বাধাকে উপেক্ষা করে আন্দোলনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল — তখন যাদব, ভূমিহার, অগ্রসর-অনগ্রসর, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ষাটের দশকে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনেও সর্বস্তরের শোষিত জনগণের মধ্যে এই ধরনের একতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। দুটি আন্দোলনেই এস ইউ সি আই তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামিল হয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বকারী বড় বড় দলগুলি ছিল বুর্জোয়া পার্টি, সরকারে যাওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। আন্দোলনে জনতার লাঠিগুলি, মারখাওয়াকে কেন্দ্র করে জনতার মধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়, তাকেই তারা পুঁজি করে নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালায়।

পুঁজিপতিশ্রেণী যখন দেখে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতায় রেখে জনরোষ প্রশমিত করা কোনমতেই সম্ভব নয়, বরং আন্দোলন তীব্র হতে হতে সঠিক নেতৃত্ব পেলে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের দিকেই চলে যেতে পারে, তখন তারা অনন্যোপায় হয়ে রাতারাতি ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলের বিকল্প হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণীরই অন্য কোন বিরোধী দল বা জোটকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এইভাবেই '৭৭ সালের নির্বাচনে পুঁজিপতিশ্রেণী ইন্দিরা শাসনের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতি বুর্জোয়াশ্রেণীর যে দলগুলি আন্দোলনে ছিল তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাতারাতি জনতা পার্টি গঠন করে সরকারি ক্ষমতায় নিয়ে আসে। সিপিএমও সেইসময়ে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনে না থাকলেও কংগ্রেসের পরিবর্তে দ্বিতীয় বুর্জোয়া বিকল্প জনতা পার্টির সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করে ফেলে। কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের রাজনীতি শুরু হয়। তারপর থেকে কংগ্রেসের মদতে বা প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কোন কোয়ালিশন বা বিজেপি'র মদতে বা প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কোন কোয়ালিশন কেন্দ্রে শাসন করে চলেছে। এই উপায়েও বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনই অব্যাহত থেকেছে, তা যার নেতৃত্বে বা মদতেই হোক না কেন। তাই বিশ্বপুঁজিবাদের তীব্র সংকটের মধ্যেও পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফা অটুট রাখার জন্য জনগণের ওপর ক্রমাগত আর্থিক বোঝা চাপছে এবং জনতা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। শুধু আর্থিক দিক থেকেই জনতা নিঃস্ব হচ্ছে না, পুঁজিবাদ জনজীবন থেকে সংস্কৃতি, নীতি-আদর্শ, মনুষ্যত্ব সব কেড়ে নিচ্ছে। জনসাধারণকে কোনমতেই ভুললে চলবে না যে, এই পুঁজিবাদই তাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী উন্নত রাজনৈতিক চেতনা ও সংস্কৃতির আধারে গণআন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্র ও শক্তিশালী করার পথেই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর জাত-ধর্ম দিয়ে বিহারের মানুষের সমস্যা যাবেনা

পাঁচের পাতার পর

নির্বাচনকেও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। নির্বাচনেও সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব চিনে নিতে হবে এবং তাকেই শক্তিশালী করতে হবে। কে জিতবে এই প্রশ্ন তুলে মূল বিষয় গণ্ডগোল করে দেওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, বিপ্লবী পার্টি বাদ দিয়ে যেই জিতুক, গরীবরা হারবে, বড়লোকরা শোষকরা জিতবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে গণআন্দোলনগুলিকে যেমন পরিচালনা করতে হবে, নির্বাচনেও সেইভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জনগণের পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনার জন্য বুর্জোয়ারা দ্বিদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করেছে, আবার ধর্ম-জাত পাতের প্রশ্ন তুলে গরীব মানুষের ঐক্যকে ভাঙছে। আমাদের দল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সাথে সাথে দলবিচারের ক্ষেত্রে দলগুলির শ্রেণীচরিত্র বিচারের প্রশ্নটি বারবার জনগণের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। জয়প্রকাশের আন্দোলনের সময়ও আমরা দেখিয়েছি যে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে গণসংগ্রাম কমিটি, ছাত্র সংগ্রাম কমিটিগুলি বিহারে গঠিত হয়েছে, সেগুলিকে উন্নত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনগণের সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারের ঢাক্কানিনাদে আমাদের কথা চাপা পড়ে যায়। লালুপ্রসাদ, নীতিশকুমার, রামবিলাস পাসোয়ান সহ অন্যান্য যেসমস্ত নেতা আজ সারা দেশের সামনে বিহারকে অসম্মানিত করছেন, তাঁরা সবাই সেই আন্দোলনের মাধ্যমেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের দৌলতেই আজ তাঁরা বুর্জোয়া সংসদীয় ক্ষমতায় গিয়ে চরম ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে জনবিরোধী নীতি কার্যকর করছেন। জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের লক্ষ্য এটা ছিল না। এর ফলে যত তাঁরা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন, নির্বাচনে জেতার জন্য ততই তাঁরা সমাজবিরোধী মাসলম্যান ব্যবহার ও জাতপাতের ভাবনাকে উস্কে দেওয়ার রাস্তা ধরেছেন।

জনগণকে একথাও ভুললে চলবে না যে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ধর্মের নামে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, ভ্রাতৃঘাতী উন্মাদনায় জনগণকে ফাঁসিয়ে দেয়। একইভাবে জাতিবাদী জোট তৈরি বা জাতপাতের ধারণার বিস্তার জনতার মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসে। এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। লালুজীর মুসলিম-যাদব সমীকরণ, পাসোয়ানজীর দলিত-মুসলিম সমীকরণ অথবা নীতীশজীর লব-কুশ সমীকরণের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আজ যে মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী আর্থিক নীতির কারণে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তা কি শুধু হিন্দুর ক্ষেত্রে হচ্ছে? মুসলমানদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না? অথবা কোন কারখানায় যখন ছাঁটাই হচ্ছে, তখন কি তা জাতপাত দেখে হচ্ছে? বিষয়টা এরকম নয়। চাষী তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না — সে মুসলমান চাষীই হোক্ অথবা হিন্দু চাষী, যাদব চাষী হোক্। ভূমিহার, রাজপুত জাতির অথবা কুর্মি বা কোইরির — সবাইকেই এই আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির আঘাত সবার উপরেই পড়ছে। সব জাতির গরির চাষী এবং মজুর কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। কোন জাতি বা ধর্মের মানুষকেই এই সমস্যা ছাড়ছে না। জাতি, ধর্ম, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। এগুলিকে রাজনীতি এবং সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে কখনই যুক্ত করা উচিত নয়। এগুলিকে যারা রাজনীতিতে টেনে নিয়ে আসছে — তারা কোন জাতি বা ধর্মের মানুষের উপকারের জন্য তা করছে না, গদি দখলই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, এই রামবিলাস পাসোয়ানের একটি ভোট কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে পড়ার ফলে ১৩ মাসের বাজপেয়ী সরকারের পতন হয়েছিল, দেশকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ধাক্কায় পড়তে হয়েছিল। অথচ নির্বাচনের পরে অটলবিহারী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হতে সেই রামবিলাস পাসোয়ানের আটকায়নি। এই রামবিলাস পাসোয়ানই গত লোকসভা নির্বাচনে লালুজীর সাথে জোট করে নির্বাচনে লড়েছিলেন এবং একসাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও আছেন। যে লালুপ্রসাদ বিহারে জনবিরোধী দুর্নীতিপরায়ণ, উন্নয়ন তহবিলের টাকা লুণ্ঠনকারী, অপরাধী-ঠিকাদারদের পৃষ্ঠপোষক — তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারে জনহিতৈষী, দুর্নীতিমুক্ত এবং বিবেকবান হয়ে গেলেন কী করে? রামবিলাস পাসোয়ান এবং লালুপ্রসাদের মধ্যে এই বিরোধ কি তাহলে নীতিগত, না গদি দখলের?

তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির ক্ষমতালোলুপতা, নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদী চরিত্রও সকলের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ২০০০ সালে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের পরে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার এবং বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল - কংগ্রেস জোট সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সিপিআই, সিপিএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এবং এস ইউ সি আই মিলে বাম সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাঁচ বছর ধরে একসাথে নানা যুক্ত কর্মসূচিও পালন করা হয়। কিন্তু যেমাত্র লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হল, তৎক্ষণাৎ সিপিআই ও সিপিএম বামসমন্বয় সমিতি ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে ফেলল। ফলে বাম সমন্বয় সমিতির কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলল। যে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সর্বোচ্চ নেতা লালুপ্রসাদকে বাম সমন্বয় সমিতির আমরা বলতাম তহবিল তছরূপকারী, কেলেঙ্কারীর নায়ক, অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক এবং যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের কর্মসূচিও আমরা নিয়েছিলাম — নির্বাচনে সেই লালুপ্রসাদকে শক্তি জোগাতেই সিপিআই, সিপিএম নেতারা মাঠে নেমে পড়লেন।

আসন্ন নির্বাচনেও সিপিআই, সিপিএম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য নয়, বা কোনও বামপন্থী লাইনের ভিত্তিতেও নয়, কোন্ জোটের পার্টিগুলির সাথে থাকলে বেশি সিট পাওয়া যাবে, একমাত্র সেই হিসাব করেই নির্বাচনে নেমেছে। সিপিএম যেখানে রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং কংগ্রেস প্রভাবিত যাদব-মুসলিম ভোট পেয়ে কিছু সিট সংগ্রহের মতলবে রয়েছে, সিপিআই সেখানে রামবিলাস পাসোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি, মুলায়ম সিংহ যাদবের সমাজবাদী পার্টির প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে দলিত-মুসলিম ভোটের ওপর নির্ভর করছে।

আজ বিহার বন্যা ও খরায় বিপর্যস্ত। গরিব চাষী-মজুর কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে দূরদূরান্তে পালাচ্ছে। শিল্পের দিক থেকে বিহার অনেক পিছনে পড়ে আছে। যেসব শিল্পোদ্যাগ ছিল, যেমন চিনিকল, রোহতাস ইন্ডাষ্ট্রি, ছোট ছোট কারখানা, অথবা কাঁটি এবং বারাউনি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বারাউনি সার কারখানা, চর্মশিল্প, হ্যান্ডলুম, পাওয়ারলুম সমস্তই ধুঁকছে। মুজফফরপুর ও মোকামার ভারত ওয়াগন বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের একমাত্র সরকারি ওষুধ তৈরির কারখানা আই ডি পি এল বন্ধ। সরকারি হাসপাতালের অবস্থা খুবই খারাপ। সেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সারা বিহার অপরাধী-রাজনৈতিক নেতা-পুলিশ আঁতাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরণ অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায় এ রাজ্যে একটি শিল্পের রূপ নিয়েছে। আর একে রক্ষা করছে উপরোক্ত আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতাসীন ও বিপক্ষ দলের নেতারা। এইসব বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কোন উদ্বেগই নেই। তাঁরা জাতপাতকে কেন্দ্র করে হার-জিতের অঙ্ক কষছে। কেউ মুসলমানদের টানবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আবার কেউ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলিকে টানতে চেষ্টা করছে। কেউ হরিজন, আবার কেউ উচ্চবর্ণদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এতেই সবাই মগ্ন হয়ে রয়েছে। এ রাজ্যে উচ্চবর্ণের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, অনগ্রসর শ্রেণী থেকেও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। এখানে ভূমিহার জাতির শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজপুত জাতির চন্দ্রশেখর সিংহ এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, দলিতদের ভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রী এবং রামসুন্দর দাস, পিছিয়ে-পড়াদের মধ্য থেকে লালুপ্রসাদ, রাবড়ি দেবী, দারোগা রায়; অতি পিছিয়ে-পড়াদের প্রতিনিধি কর্পূরী ঠাকুর, ব্রাহ্মণ থেকে বিনোদানন্দ ঝা, জগন্নাথ মিশ্র, কেদার পাণ্ডে, বিন্দেশ্বরী দুবে, ভগবত ঝা আজাদ, মুসলিমদের আব্দুল গফুর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এইজন্য যারা অগ্রসর-অনগ্রসর, এই জাত ঐ জাত, এই ধর্ম ঐ ধর্মের ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর কথা বলছে, তারা আসলে বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট ভাগাভাগি করে লাভ তুলতে চাইছে। এতে জনতার ক্ষতি ছাড়া কোন মঙ্গল নেই।

এস ইউ সি আই গণআন্দোলনে বিশ্বাস করে এবং জনতাকে এই কথাই বলে যে, এর মাধ্যমেই জনগণ তার অধিকার আদায় করতে পারবে, গণআন্দোলনের শক্তিতেই শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে। আমাদের দল নির্বাচনকেও গণআন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে দেখে। এই কারণে আমাদের দল সমস্ত বামদলের কাছে একথা ভেবে দেখবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে যে, বামপন্থী লাইনের ভিত্তিতে গণআন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে নির্বাচনী আন্দোলনেও ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা লড়ব, নাকি দক্ষিণপন্থীদের মতোই নীতি-আদর্শ ত্যাগ করে সুবিধাবাদ এবং চেয়ার দখলের হুল্লোড়ে মেতে উঠব। তাদের ভূমিকার কারণেই জনসাধারণ আজ বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থার মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাচ্ছে না। এস ইউ সি আই সর্বদাই বামপন্থার ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছে। আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি যে, গণআন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করুন। যেসব কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থীরা আছেন, তাঁদের জয়যুক্ত করুন। যেখানে এস ইউ সি আই প্রার্থী নেই, সেখানে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার মতো প্রার্থীকে জয়যুক্ত করুন, যাতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

বিহার নির্বাচনে

এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

জেলা মুঙ্গের

হাভেলি খড়্গপুর -কমরেড ভোলা তাঁতি
তারাপুর - কমরেড ভরত মণ্ডল

জেলা বাঁকা

বেলহার - কমরেড ভুবনেশ্বর পাশোয়ান

জেলা জাহানাবাদ

জাহানাবাদ - কমরেড উমা শঙ্কর বর্মা

জেলা মজঃফফরপুর

কাঁটি - কমরেড তারকেশ্বর গিরি
পারা - কমরেড রামপ্রীত রায়
সাহেবগঞ্জ - কমরেড যাদবলাল প্যাটেল

জেলা বৈশালী

লালগঞ্জ - কমরেড রাজেন্দ্র শর্মা

বানের গ্রাসে চাষীর জমি

একের পাতার পর

অভিজ্ঞতা তুলে ধরে দেখিয়েছিলাম, প্রতিবছর নদীবাঁধ ভাঙছে। শুখা মরসুমে বাঁধ শক্তপোক্ত করার কোন কাজ সরকার প্রশাসন কখনই করেনা। প্রতিবছরই বর্ষাকালে জলোচ্ছাসে ও প্লাবনে বাঁধ ভেঙে যাবার পরই তারা ভাঙন রোধের নামে টাকা ঢালে। পরিণামে ঠিকাদারসহ স্তরে স্তরে অফিসারদের পকেট ভরে। রাইটার্স বিল্ডিংস পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতিচক্র নাকি এই টাকার ভাগ পায়। পরের বছর আবার বাঁধ ভাঙে, আবার টাকার খেলা চলে। ফলে নদীবাঁধ ভাঙলেই যেখানে মুনাফা, সেখানে নদীবাঁধ উপযুক্তভাবে মেরামত হোক — প্রশাসন তা চাইবে কেন ?

এবছরও দ্বীপাঞ্চলগুলির মানুষ বর্ষা শুরু হতেই সর্বনাশের আশঙ্কায় দিন গুণছিল এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে নদীবাঁধ মেরামতের আবেদন জানাচ্ছিল। এস ইউ সি আই-এর বিভিন্ন ব্লক শাখাও বিডিও এবং ইরিগেশন দপ্তরে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের স্বপ্নে মশগুল মন্ত্রী ও প্রশাসনের কানে সেইসব আবেদন ঢোকেনি। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ জয়নগর-কুলতলিসহ সুন্দরবন অঞ্চল থেকে কী করে এস ইউ সি আই-কে খতম করা যায়, তার জন্য ব্যস্ত। ফলে, নিম্নচাপজনিত সমুদ্রের জলোচ্ছাস ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এলাকার পর এলাকা। যে বাঁধগুলি এখনও ভাঙেনি, সেগুলিতেও জলোচ্ছাসের জল ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে বাঁধগুলি শীর্ণরেখার মত কোনক্রমে জেগে আছে। বিধ্বস্ত এলাকাগুলির মধ্যে অবিরাম জোয়ার-ভাটা চলায় সেগুলি গভীর খালে পরিণত হয়েছে। মহালয়া কোটালের আগে যদি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঐ সমস্ত বাঁধ মেরামত না করা হয় তবে পুনরায় জলোচ্ছাসে সমগ্র সুন্দরবন বিশাল সমুদ্রের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এই বিপন্ন এলাকাগুলির চরম দুরবস্থা সত্ত্বেও প্রথমে সরকার তথা প্রশাসনের কোন হেলদোল ছিল না। বিপন্ন মানুষ প্রশাসনের কাছে বারংবার ত্রাণের দাবি জানিয়েছে। তার জবাবে প্রশাসন যা ত্রাণ পাঠিয়েছে, প্রায়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য। পেটের অসুখ, জ্বর সহ নানা রোগ ছড়িয়ে পড়লেও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, ওষুধপত্র নেই, শিশুখাদ্য নেই। অবিলম্বে মেডিকেল টিম না পাঠালে মহামারি দেখা দিতে পারে। বাঁধ মেরামতির ক্ষেত্রেও সেচবিভাগ ও বিডিও কোন দায়িত্ব পালন করছে না।

ফলে চাষী আজ সর্বদিক থেকেই আক্রান্ত-বিপন্ন। বীজ, সার, কীটনাশকের অগ্নিমূল্য, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, অথচ ফসলের দাম সামান্য — এসবতো ছিলই, তার সঙ্গে নদী ও সমুদ্রের বাঁধের ভাঙন তাদের একেবারে আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে ঠেলে দিয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে শুনিয়েছিলেন, তাঁর সরকার রাজ্যবাসীকে একটি সংবেদনশীল প্রশাসন উপহার দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর সরকার ও প্রশাসনের বিন্দুমাত্র সংবেদনশীলতা সুন্দরবন অঞ্চলের বিপন্ন মানুষ দেখতে পাচ্ছেনা।

২৯ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সামিল শ্রমজীবী মানুষ

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমন্বয়ে গঠিত স্পনসরিং কমিটির ডাকে ১৬ দফা দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে পশ্চিমবঙ্গে গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এস ইউ সি আই-এর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ কে কে এম এস, এ আই ডি এস ও, এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও প্রভৃতি সকল গণসংগঠনগুলি নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তির উপর দাঁড়িয়ে দেশের প্রায় সকল রাজ্যে কোথাও এককভাবে, কোথাও যৌথভাবে ধর্মঘটের কর্মসূচি পালন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শ্রমজীবী

২৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে বেহালায় মিছিল

সাধারণ মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই ধর্মঘট সফল করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণকে অভিনন্দন জানানোর সাথে সাথে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ''আমরা মনে করি, আজকের ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সূচনা মাত্র। আন্দোলনকে সংহত, বিস্তৃত, তীব্রতর ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে লাগাতার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার মধ্যে বহু দাবির সাথেই রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব ও ভূমিকা জড়িত। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া আন্দোলন যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।''

পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে ধর্মঘটকে সফল করবার আবেদন নিয়ে কারখানার গেট থেকে জেলা শহরের কেন্দ্রগুলিতে গেটসভা, পথসভা, ও জনসভা সংগঠিত করা হয়। কলকাতার সর্বত্র ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস সহ ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির উদ্যোগে ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্ত মিছিল হয়। গার্ডেনরিচ, তারাতলা, রামনগর, হাইডরোড, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ফেয়ারলি প্লেস, হাজরা, মৌলালি, বেহালা, মহেশতলা, বজবজ, মল্লিকবাজার, সল্টলেক, মানিকতলা, কাঁকুড়গাছি ও যাদবপুরে পথসভা হয়। প্রতিটি সভায় ইউ টি ইউ সি-এল এসের জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাগুলিতে শ্রমিক-কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষের সমাগম হয়। সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন সংস্কারের পরিকল্পনা সহ সমস্ত জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধে যুক্ত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ ২-৪ ডিসেম্বর ইউ টি ইউ সি-এল এসের রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান। কলকাতার ডালহৌসি অঞ্চলে ইউ টি ইউ সি-এল এসের কর্মীরা বাসে বাসে উঠে ব্যাপক প্রচার চালান। প্রচারে উৎসাহিত হয়ে এসপ্ল্যানেড এলাকায় কোন কোন বাসযাত্রী ধর্মঘটের সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-এল এসের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যও রাখেন।

২৯ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় ব্যাপক মানুষ ধর্মঘটে সামিল হয়ে মিছিল, মিটিং, পিকেটিং করেন। কলকাতার সর্বত্র ধর্মঘটের সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-এল এস, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস যাদবপুর থেকে দমদম-নাগেরবাজার, গার্ডেনরিচ থেকে মধ্যকলকাতায় অসংখ্য মিছিল বের করে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য অফিস থেকে সকাল ৯টায় রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। বেশ কয়েকজন পথচারী এই মিছিলে যোগ দেন। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল তালতলা মোড়ে পৌঁছালে সেখানে একটি সভা হয়। সভায় কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আজ মালিকশ্রেণীর স্বার্থে নয়া শ্রমআইন প্রণয়ন করতে চলেছে। রাজ্য সরকারগুলিও একই নীতি কার্যকর করছে, এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

তিনি বলেন, মালিকশ্রেণী ও সরকারগুলো যখন শ্রমজীবী মানুষের উপর একের পর এক হামলা করছে, ছাঁটাই করছে, মজুরি কমিয়ে দিচ্ছে, ৮ ঘণ্টার বদলে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি প্রচারের ঝড় তোলে না, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না, কিন্তু যখন শ্রমিকরা কোনও আন্দোলনে নামে, বন্‌ধ ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়, তখনই সংবাদমাধ্যম 'গেল গেল' রব তুলে দেয়। গরিব মানুষের ৩৬৫ দিন কীভাবে কাটে, তার খোঁজ যারা রাখে না, তারাই ১ দিন ধর্মঘটে 'গরিবের ক্ষতি' নিয়ে চোখের জল ফেলে। এদের এই ভূমিকাই বুঝিয়ে দেয়, এরা কাদের স্বার্থে কাজ করছে। তিনি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান ও ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে যুক্ত শ্রমিক আন্দোলনের জন্য উদ্যোগী হতে আবেদন করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর চেয়াইতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির যৌথ বিক্ষোভ

১৪ নভেম্বর লক্ষাধিক চাষীর মহাকরণ অভিযান

একের পাতার পর

তেলে চলে না, অথচ তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে সরকার ট্রামেরও ভাড়া বাড়াচ্ছে। এই হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা মনে করি, এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী। একসময় এই রাজ্যে ১ পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কী বিরাট আন্দোলন হয়েছিল, আমরা ছিলাম, সিপিএমও ছিল। সেদিন তারা আন্দোলনে ছিল জনগণের বিক্ষোভ কাজে লাগিয়ে গদিতে বসার জন্য। আজ গদিতে বসে তারাই মালিকের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে দফায় দফায় ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছি। সরকার চালাকি করে মহালয়ার দিন বাড়তি ভাড়া চালুর সিদ্ধান্ত করেছে। ভেবেছে, এই সময় মানুষ উৎসবে ব্যস্ত থাকবে, ফলে আন্দোলন হবে না। আমরা কিন্তু ৩০ তারিখ থেকেই বিক্ষোভ ও প্রচার আন্দোলন শুরু করছি, লাগাতার এই আন্দোলন চলবে। যাত্রী সাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, সর্বত্র যাত্রী কমিটি গঠন করে পুজোর পর থেকে বাড়তি ভাড়া বয়কট করুন।

অন্যদিকে গ্রামে কী হচ্ছে দেখুন। সেখানে কৃষকদের জমি জবরদখল করে সরকার জমির দালালি করছে। শিল্পায়নের নামে তারা কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি কম দামে, ৮/১০ হাজার টাকা কাঠা দরে কিনে নিয়ে সালিম সহ নানা মালিকদের বিক্রি করবে কাঠা প্রতি ১ লাখ, দেড় লাখ টাকায়। যারা জমি কিনবে তারাও আবার সেটা বিক্রি করবে আরও বেশি দরে। এই হচ্ছে জমি নিয়ে ফাটকাবাজি। শিল্পের সঙ্কট বিশ্বজুড়ে; ফলে পুঁজি এখন শিল্পে যাচ্ছে না। পুঁজির মালিকরা তাদের অলস পুঁজি ঢালছে ফাটকায়, রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়, আবাসন ব্যবসায়। পুঁজিপতিরা আবাসন শিল্পের নামে এই জমিতে বিশাল বিশাল বাড়ি, গল্ফ খেলার মাঠ বানাবে, হাসপাতালের নামে বড়লোকদের চিকিৎসার জন্য বড় বড় ব্যয়বহুল নার্সিং হোম, প্রমোদনগরী বানাবে; কামাবে বিপুল মুনাফা। সরকার একেই শিল্পায়ন বলে মিথ্যাপ্রচার করছে। বাস্তবে এ রাজ্যে শিল্প বন্ধ হচ্ছে। গত ১৫ বছরে রাজ্যে ২৯ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে; শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে ১২ লক্ষাধিক, কিন্তু কাজ পেয়েছে মাত্র ৪৩ হাজার ৭৯৯ জন। এই হচ্ছে তাদের শিল্পায়নের নমুনা।

সরকার বলছে, জমিচ্যুত চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেবে। অথচ রাজারহাটে যারা ১০ বছর আগে জমি হারিয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে আজও সরকারি দপ্তরে ধর্না দিচ্ছে। এই হচ্ছে ওদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া! সরকার বলছে, জমিচ্যুতদের কর্মসংস্থান হবে ; সরকার জবাব দিক বক্রেশ্বরে, দুর্গাপুরে, হলদিয়ায় যারা জমি হারিয়েছে, তাদের ক'জন চাকরি পেয়েছে? তারা এখন অধিকাংশই কলকাতার ফুটপাতবাসী। এই ওদের কর্মসংস্থানের নমুনা! শুধু কি জমির মালিক? এইসব জমিতে যেসব খেতমজুরেরা কাজ করছে তারা কোথায় যাবে? তারা সব ফুটপাতের ভিখারি হবে — যা হচ্ছে সমস্ত জায়গায়।

উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? উন্নয়ন বলতে বোঝায় — কর্মসংস্থান বাড়ছে, কলকারখানা বাড়ছে, কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। এ রাজ্যে কি সেসব হচ্ছে? এ রাজ্যে খরা-বন্যায় কৃষি বিপর্যস্ত। ভাঙনে মুর্শিদাবাদ ও মালদার গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নেই। গত কোটালে সুন্দরবনের জীর্ণ নদীবাঁধগুলো ভেসে গিয়েছে। হাজার হাজার বিঘা ধানজমি, সব্জি বাগান, মেছোঘেরি লোনাজলের তলায়। মানুষের অবস্থা শোচনীয়, পানীয় জল নেই, ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, ধান-সব্জি সব পচে গেছে। মহালয়ার কোটালে আবার প্লাবনের আশঙ্কায় মানুষ উদ্বিগ্ন। অথচ রাজ্য সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এইভাবে তারা গ্রামের উন্নয়ন করছে! পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে খাজনা বাড়াচ্ছে বিপুল হারে। জমির একর প্রতি খাজনা ও সেস ১৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তারা করেছে ২০ গুণেরও বেশি — ৩৭০ টাকা এবং কৃষিক্ষেত্রে করেছে দ্বিগুণেরও বেশি — ৩৮ টাকা; মিউটেশন ফি একর প্রতি ৭৫ পয়সা থেকে বাড়তে বাড়তে এখন ১০০ টাকা; জমি রেজিস্ট্রেশন ফি লাগত মোট মূল্যের ৩ শতাংশ, এখন লাগছে ৮ শতাংশ; ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ চালিত সেচের ক্ষেত্রে ৫ হর্সপাওয়ার মোটরের বাৎসরিক মাশুল ছিল ২,০৪০ টাকা, এখন হয়েছে ৪ গুণেরও বেশি — ৮,৯৩০ টাকা। '৯৫ সালে বিদ্যুৎচালিত মিনি ডিপ-টিউবওয়েলে বার্ষিক বিদ্যুৎ মাশুল ছিল ৩,০৬০ টাকা, এখন হয়েছে ৩ গুণেরও বেশি — ১০,৯৪৮ টাকা। কী হারে বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন। যেখানে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের সরকার সেচের কাজে চাষীদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, পাঞ্জাব সরকার ইউনিট প্রতি নেয় মাত্র ২৫ পয়সা, সেখানে আমাদের রাজ্য সরকার কৃষিতে বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি সাড়ে তিন টাকা আদায় করে। এটিও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির আর একটি নমুনা!

এছাড়া, সার-বীজ-কীটনাশকের দামও ব্যাপকহারে বাড়ছে। এর সঙ্গে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাপক ট্যাক্স চাপাচ্ছে। হাঁস, মুরগি, গরু, সাইকেল, রিক্সা, গোরস্থান, শ্মশান — সবকিছুর উপর ট্যাক্স ধার্য করছে। সরকার পঞ্চায়েতগুলোকে হুমকি দিচ্ছে — ট্যাক্স না চাপালে সরকার টাকা দেবে না। ফলে কৃষকরা আজ ভয়ঙ্কর আক্রমণের সামনে। দলে দলে কৃষক জমিহারা হচ্ছে। এখন ৬০ শতাংশ কৃষক জমিচ্যুত। স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে খেতমজুরের সংখ্যা। সরকারি হিসেবে পশ্চিমবাংলায় খেতমজুরের সংখ্যা ৭৩ লক্ষেরও বেশি, বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি, বছরে এরা কাজ পায় মাত্র ১১৪ দিন।

গ্রামাঞ্চলে এই যে আক্রমণ — তার বিরুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আন্দোলন শুরু করেছি। কৃষিতে বিদ্যুৎ বিল বয়কট চলছে গোটা পশ্চিমবাংলায়। ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের কৃষক সংগঠন আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার ব্লকে ব্লকে এবং জেলা সদরে হাজার হাজার কৃষককে সংগঠিত করে ঘেরাও, আইন অমান্য, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করবে। এরপর ১৪ নভেম্বর আমরা ১ লক্ষ কৃষকের মহাকরণ অভিযান করব। এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অতীতে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা যেমন পেয়েছি, আমরা বিশ্বাস করি, এই আন্দোলনেও তা আমরা পাব।''

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ''আমাদের দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মেডিকেলে ক্যাপিটেশন ফি-র বিরুদ্ধে দিল্লিতে কনভেনশন

মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বেতনবৃদ্ধি ও নানা কৌশলে চাপানো লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি সাধারণ ঘরের প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের সামনে মেডিকেল শিক্ষার দরজা বন্ধ করছে এবং চিকিৎসা পেশার নৈতিক মান ধসিয়ে দিচ্ছে। ১৯৮৩ এবং ২০০২ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরাসরি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ বাড়াবার ডাক দেওয়া হয়েছে। ফলে গরিবের ঘরে চিকিৎসা নেই, মধ্যবিত্তকে চিকিৎসার জন্য ঘটি-বাটি বেচতে হচ্ছে। অবস্থা যে আরও মর্মান্তিক হবে তার অশনি সঙ্কেত সুস্পষ্ট। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ২৩ সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লির বুকে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও এআইডিএসও-র যৌথ উদ্যোগে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশন থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, কংগ্রেস, সংযুক্ত মোর্চা, এন ডি এ, ইউ পি এ যারাই যখন ক্ষমতায় থেকেছে তাদের অনুসৃত এই নীতি স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ও যোদ্ধাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। গত দশ বছর ধরে অনুসৃত এই সর্বনাশা স্বাস্থ্যনীতি — ''২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'' — আলমা আটা থেকে উচ্চারিত এই প্রতিশ্রুতিকে পরিহাসে পর্যবসিত করে অবস্থাকে এমন স্তরে টেনে নামিয়েছে যাতে এখন বাস্তব হল 'টাকা যার স্বাস্থ্য তার।'

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এম এস সি) দিল্লি শাখার আহ্বায়ক ডাঃ জীতেন মুর্মু মূল প্রস্তাব পেশ করেন। এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সহসভাপতি ও কর্নাটক রাজ্য সভাপতি কমরেড শ্রীরাম মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে দেখান, কীভাবে বিগত বছরগুলি থেকে সুপ্রিম কোর্ট সহ বিভিন্ন কোর্টের রায়ে মেডিক্যাল শিক্ষাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। এম এস সি'র সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত, তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় দেখান, কীভাবে ক্যাপিটেশন ফি, তা যে নামেই চালু করা হোক না কেন, তা মেধাবিরোধী এবং বহু শতাব্দী ধরে শত সহস্র বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের সংগ্রামে গড়ে ওঠা মেডিক্যাল এথিক্সের বনিয়াদ ধ্বংস করে দেবে।

এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল তাঁর বক্তব্যে দেখান, সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যতটুকু দায়িত্ব বহন করত ১৯৮৩-র জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পর থেকে তা পালন করতে অস্বীকার করছে। সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতি ও স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানান দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেববর ব্যানার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুমের শেট্টি (সভাপতি, রেসিডেন্ট ডক্টরস' অ্যাসোসিয়েশন, লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজ), সুপ্রিয়া গুপ্ত (সম্পাদক, ঐ), জীতেন্দ্র জয়পুরিয়া (সভাপতি, বর্ধমান মহাবীর মেডিক্যাল কলেজ, দিল্লি), ডাঃ রাজেন্দ্র গিরা (হরিয়ানা), সুনীল গোপাল (মধ্যপ্রদেশ), শিশির কাকতি (আসাম), সাজার খান (কেরালা), বলেন্দ্র কাটিয়ার (ইউ পি), রাজেন্দ্র ভার্মা (ওড়িশা), বাবুল বণিক (ত্রিপুরা), ভলতেয়ার (তামিলনাড়ু)। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা। এই কনভেনশন দাবি তুলেছে (১) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংস্থার দ্বারা কমন এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি নিতে হবে, (২) ম্যানেজমেন্ট কোটা বাতিল করতে হবে, ম্যানেজমেন্টের হাতে ফি নির্ধারণের অধিকার দেওয়া চলবে না, (৩) ফি কমিয়ে ছাত্রদের নাগালের মধ্যে আনতে হবে, প্রয়োজনীয় টাকা সরকারকে দিতে হবে, (৪) কোন নামেই ক্যাপিটেশন ফি চালু করা চলবে না। সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বেতনবৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি-র বিরুদ্ধে ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ অশোক সামন্ত

১৪ নভেম্বর লক্ষাধিক চাষীর মহাকরণ অভিযান

সাতের পাতার পর

ভিত্তিতে এবং বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। অন্যদিকে তৃণমূল ও কংগ্রেস — এরা দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দল। এরা নির্বাচনী রাজনীতির লক্ষ্যে সবকিছু করছে। এরা কখনোই সুসংগঠিত গণআন্দোলনের রাস্তায় যায় না। ফলে তাদের রাজনীতি-সংগঠন-সংস্কৃতি এবং এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি-সংগঠন-সংস্কৃতিতে মৌলিক পার্থক্য আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে, আমরা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ১৯ বছর লড়াই করেছি, শেষপর্যন্ত দাবিও আদায় হয়েছে। ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিকদেরও বহু দাবি আমরা আদায় করেছি। কমরেড প্রভাস ঘোষ সর্বস্তরের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত বিক্ষোভ নয়, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ বাহিনী তথা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলুন, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বকে গ্রহণ করুন, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হোন।

মুম্বাই বন্যা — প্রোমোটাররাজের পরিণাম

চারের পাতার পর

দাঁড়িয়েছেন; সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার 'অপরাধে' এস ইউ সি আই বিধায়ক ও জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। কৃষিজমি, বাস্তু-বাগান থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করে নগরোন্নয়নের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভপ্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্বতস্ফূর্ত। একে যত সুসংগঠিত রূপ দেওয়া যাবে ততই তা সুদৃঢ় প্রতিরোধের চেহারা নেবে এবং সেটাই হবে প্রকৃতি ও মানুষের যথার্থ রক্ষাকবচ। তাতে মুনাফাশিকারিদের মুনাফা হবে না বটে, নেতামন্ত্রীদের পকেটে কাটমানির আমদানিও ঘটবে না বটে, কিন্তু চাষী বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে, প্রকৃতি বাঁচবে এবং ফলশ্রুতিতে মানব সমাজ বাঁচবে।

মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা প্রকৃতির জন্য নয়, মনুষ্য সভ্যতার জন্যই জরুরি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মুনাফালিপ্সা আজ আর কোন বাধাই মানতে রাজী নয়। যাকিছু শুভ, মঙ্গলকর — সবই তাদের মুনাফার রথচক্রের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধ বহুক্ষেত্রে এই ধ্বংস প্রতিহত করতে পারে; কিন্তু আবার নিত্য-নতুন আক্রমণের সামনে তাদের পড়তে হবে। তাই কেবল শুভ-আকাঙ্খা, নিছক প্রকৃতিপ্রেম বা পরিবেশবাদ দিয়ে একে রোধ করা যাবে না। পরিবেশ তথা মানবসভ্যতার দূষণ যে পুঁজিবাদ — তার মূলেই কুঠারাঘাত করতে হবে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনকেই প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা

জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন, ডিএম অফিসে বিক্ষোভ

সারা দেশে ৪০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে ১২ লক্ষ। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণাতে রয়েছে এক লক্ষ শ্রমিক, যাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মহিলা। সরকারি আইন অনুযায়ী যেখানে এক হাজার বিড়ি বাঁধলে ৯৯ টাকা ১৬ পয়সা পাওয়ার কথা, সেখানে এই শ্রমিকরা পায় ২০ থেকে ৩৮ টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিড়ি শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকার কথা। আয়ের ১০ শতাংশ শ্রমিক ও সমপরিমাণ টাকা মালিক দিয়ে সেই টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে জমা হওয়ার কথা। উত্তর ২৪ পরগণার বিড়ি শ্রমিকরা এই সুযোগ পায় না। ৫৫ বছর বয়স হলে পেনশন পাওয়ার কথা, তাও তারা পায় না। এই রকম অসংখ্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেলার বিড়ি শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের নেতৃত্বে।

১৫ দফা দাবিতে জেলাব্যাপী বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের প্রথম উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বারাসাতের বিদ্যাসাগর মঞ্চে। সম্মেলনে প্রায় নয়শত বিড়ি শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন — যাঁর বেশিরভাগই মহিলা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের রাজ্য সহসভাপতি চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও এস ইউ সি আই'র জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক ও ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। সম্মেলন থেকে চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং লীলা হালদার ও নৃপেন মিস্ত্রিকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনের পূর্বে সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিল ডি এম অফিসে গিয়ে ডি এমকে এবং বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের মেডিক্যাল অফিসারকে দাবিগুলি জানিয়ে স্মারকলিপি দেয়। জেলা শাসক দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in